

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুইটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। হাজার মাইলের ভৌগোলিক দূরত্ব, ভাষা ও সংস্কৃতিসহ সকল বিষয়ে অমিল থাকা সত্ত্বেও শুধু ধর্মীয় মিলের কারণে পূর্ব-বাংলাকে পাকিস্তানের একটি প্রদেশ করা হয়। এই নতুন রাষ্ট্র পূর্ব-বাংলার মানুষের জীবনে কোনো মুক্তির স্বাদ আনতে পারে নি। শাসকের হাত বদল হয়ে পূর্ব-বাংলার জনগণ নতুন আরেকটি ভিনদেশি শাসক দ্বারা শাসিত হতে থাকে। পরবর্তী কালে অনেক আন্দোলন, সংগ্রাম, ত্যাগ-তিতীক্ষা ও রক্তের বিনিময়ে ১৯৭১ সালে স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা পরিপূর্ণভাবে বিদেশি শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করি। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের জন্ম-ইতিহাসের পথ অনেক ঘটনাবল্ল। সপ্তম শ্রেণিতে আমরা ভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট গঠন, ছয়দফা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও ৭০ এর নির্বাচন সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছি। এই অধ্যায়ে আমরা ১৯৭০ এর নির্বাচন পরবর্তী সময় ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা—

- ১৯৭০ এর নির্বাচনোত্তর জনগণ এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করতে পারব;
- ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের মূলকথা জানব ও এর গুরুত্ব ও প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন করতে পারব;
- ২৫শে মার্চের নারকীয় হত্যায়জ্ঞের বিবরণ দিতে পারব ও এর ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পারব;
- ২৬শে মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণা উল্লেখ করতে পারব;
- মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতির বিবরণ দিতে পারব ও অস্থায়ী সরকারের গঠন ও ভূমিকা বর্ণনা করতে পারব;
- মুক্তিবাহিনীর গঠন বর্ণনা করতে ও তাদের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারব;
- সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তির তৎপরতা ও ভূমিকা বর্ণনা করতে পারব;
- মুক্তিযুদ্ধে বাঙালিদের সহযোগিতার স্বরূপ বর্ণনা ও মূল্যায়ন করতে পারব;
- মুক্তিযুদ্ধে বহির্বিশ্বের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারব;
- মুক্তিযুদ্ধে যৌথবাহিনীর ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারব;
- মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা ও অত্যাচারের বিবরণ দিতে পারব;
- পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের ঘটনা বলতে পারব;
- মুক্তিযুদ্ধের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারব;
- দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ ও গণতান্ত্রিক চেতনায় উজ্জীবিত হব।

পাঠ-১ : সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি

১৯৭০ সালে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু বিজয়ী আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে পাকিস্তানি সামরিক জাভা ষড়যন্ত্র শুরু করে। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বার বার স্থগিত ঘোষণা করলে আওয়ামী লীগ সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের মার্চের শুরু থেকে অসহযোগ আন্দোলন এবং ৭ই মার্চ ‘ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে’ তোলার ডাক দেন। ফলে বাঙালির স্বাধীনতার প্রস্তুতি শুরু হয়। অন্যদিকে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ২৫শে মার্চ বর্বর গণহত্যা শুরু করে। ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার মাধ্যমে শুরু হয় বাঙালির প্রতিরোধ ও মুক্তিযুদ্ধ। মুজিবনগরে গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনায় পরিচালিত নয় মাসের যুদ্ধ শেষে ১৬ই ডিসেম্বর বাঙালি বিজয় লাভ করে।

একদিকে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা গ্রহণের প্রস্তুতি নেয় আর অন্যদিকে তৎকালীন পাকিস্তান গিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো তা বানচালের জন্য ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে ষড়যন্ত্র শুরু করেন। তিনি ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বর্জনের ঘোষণা দিয়ে পাকিস্তানের রাজনীতিতে নতুন সংকট তৈরি করেন। পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া তীব্র হয়। ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবিতে আওয়ামী লীগের সকল কর্মসূচিতে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেয়। বিশেষ করে ছাত্রদের ভূমিকা ছিল অগ্রণী। এছাড়া শিক্ষক, পেশাজীবী ও মহিলা সংগঠনগুলোও এগিয়ে আসে। একান্তরের মার্চের শুরু থেকে প্রতিদিনের সকল সমাবেশে প্রচুর লোকের সমাগম ঘটে। ভুট্টোর ষড়যন্ত্রে সাড়া দিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১লা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করার আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। ফলে ওই দিন আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি কমিটির বৈঠকে সর্বাত্মক আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। জনগণ এবারও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেয়। শুরু হয় বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের আরেক অধ্যায়-অসহযোগ আন্দোলন।



স্বাধীন বাংলার প্রথম পতাকা

আওয়ামী লীগ ২রা মার্চ ১৯৭১ ঢাকা শহরে ও ৩রা মার্চ সারা দেশে হরতালের ডাক দেয়। ২রা মার্চ সকাল ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বিশাল সমাবেশে ছাত্রলীগ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নেতৃবৃন্দ দেশের মানচিত্র খচিত স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। এটিই ছিল সর্বসাধারণের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তোলিত 'স্বাধীন বাংলার' প্রথম পতাকা। মুক্তিযুদ্ধে এ পতাকা ছিল আমাদের প্রেরণা। ৩রা মার্চ থেকে শুরু হয় সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন যা ২৫শে মার্চ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ৩রা মার্চ গঠিত হয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। এতে আন্দোলন আরও বেশবান হয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করে এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়।

এ পরিস্থিতিতে তীব্র হয়ে ইয়াহিয়া খান ৬ই মার্চ এক বেতার ভাষণে ২৫শে মার্চ ঢাকায় পুনরায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সে ঘোষণায় সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। এ পরিস্থিতিতে ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণার জন্য আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জনসভার আয়োজন করা হয়।

কাজ : পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্যে বাঙালির ঐক্যতির চিত্র তুলে ধরো।

পাঠ-২ : ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ও বাঙালির স্বাধীনতার ঐক্যতি

বঙ্গবন্ধু তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণে বিজয়ী দল হিসাবে আওয়ামী লীগের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশ পরিচালনার ঘোষণা দেন। জনগণের প্রতি পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সর্বাঙ্গিক অসহযোগিতার নির্দেশ দিয়ে তিনি তাঁর ভাষণে কোর্ট-কাচারি, অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন। আমরা জানি একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র পরিচালিত হয় জনগণের ট্যাক্স বা খাজনায়। তিনি তাঁর ভাষণে আরও বলেন, “যে পর্বত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো।”



বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের দৃশ্য

বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ থেকে ইয়াহিয়া ও তার সহযোগী ভুট্টোর কর্মকাণ্ড দেখে বুঝেছিলেন এরা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। তাই তিনি একদিকে আলোচনা ও অন্যদিকে চূড়ান্ত সংগ্রাম ও ত্যাগের মাধ্যমে স্বাধীনতার জন্য জাতিকে প্রস্তুত হতে আহ্বান জানান। প্রয়োজনে যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তিনি বলেন, “প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো।” বক্তৃতার আর এক জায়গায় তিনি বলেন, “প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।” এ কথায় গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মুক্ত করার প্রকাশ্য নির্দেশনা পাওয়া যায়। দশ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে তিনি তাঁর এ বক্তৃতায় ‘বাংলাদেশ’ শব্দটি ব্যবহার করে ভবিষ্যৎ নতুন রাষ্ট্রের নামকরণ চূড়ান্ত করেন। বঙ্গবন্ধুর ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে বাঙালিকে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত রাখা। বক্তৃতায় শেষ অংশে “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম” ঘোষণা দিয়ে তিনি স্পষ্টভাবেই স্বাধীনতার ডাক দেন। বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথ উন্মুক্ত করতে ইয়াহিয়া ঘোষিত ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করার ব্যাপারে ৪টি পূর্বশর্ত ঘোষণা করেন।

১. সামরিক আইন প্রত্যাহার
২. নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর
৩. সেনাবাহিনীর গণহত্যার তদন্ত
৪. সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া

এ দাবিগুলো মেনে না নেওয়া পর্যন্ত তিনি অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেন। ইয়াহিয়ার নেতৃত্বে পাকিস্তানের সামরিক শাসকরা বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিক এ দাবিগুলো কখনো মেনে নেয় নি। ফলে বাঙালির আন্দোলন বেগবান হয়ে উঠে।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ। এ ভাষণ সারাদেশের মানুষকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে। তাদের ঐক্যবদ্ধ করে এবং সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে। এ ভাষণ যেন জাদুর স্পর্শে বাঙালি জাতিকে বীরের জাতিতে রূপান্তরিত করেছে। এ ভাষণ বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত। ইউনেস্কো ২০১৭ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণকে ‘ওয়ার্ল্ড ডকুমেন্টারি হেরিটেজ’ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই ভাষণ ইন্টারন্যাশনাল ‘মেমোরি অফ দ্যা ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার’-এ গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টারি ঐতিহ্য হিসাবে ইউনেস্কো অন্তর্ভুক্ত করেছে। বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ পৃথিবীর একমাত্র অলিখিত ভাষণ হিসাবে বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ ভাষণের নির্দেশনা অনুযায়ী ঐক্যবদ্ধ জনগণ অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেয় এবং মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা অনুযায়ী, দেশের স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, কল-কারখানা সব বন্ধ হয়ে যায়। বিক্ষুব্ধ জনতা পাকিস্তানি বাহিনীকে বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধ করতে থাকে। খাজনা-ট্যাক্স আদায় বন্ধ হয়ে যায়। সেনানিবাস ব্যতীত সর্বত্র বঙ্গবন্ধুর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত

হয়। গভর্নর হাউস, সেনানিবাস কিংবা সচিবালয় থেকে নয়, সেদিন বাংলাদেশ পরিচালিত হর দানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কের বঙ্গবন্ধুর বাড়ি (৬৭৭ নম্বর) থেকে। এটাই হয় সরকারের কার্যালয়। আর আওয়ামী লীগের সদর দপ্তরে দলের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়নের কাজ চালিয়ে যান। অবস্থা উপলব্ধি করে ইয়াহিয়া ১৫ই মার্চ ঢাকা সড়কে আসেন এবং বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার প্রস্তাব দেন। ১৬ই মার্চ থেকে আলোচনা শুরু হয়। ২২শে মার্চ ক্ষুধারিকার আলী ভূট্টো ঢাকায় আসেন এবং আলোচনায় অংশ নেন। আলোচনা ব্যর্থ করে বাঙালি নিখমের নির্দেশনা নিয়ে ২৫শে মার্চ রাতে ইয়াহিয়া-ভূট্টো ঢাকা ত্যাগ করেন। আর ওই দিনই মধ্যরাত্রে তারা বাঙালির উপর চরম আঘাত হানেন। ওই কালরাতে পাকিস্তানি সেনারা অসংখ্য বাঙালিকে নির্বিচারে হত্যা করে।

কাজ-১ : মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের বড়বন্ধ ও বাঙালিদের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করো।

কাজ-২ : প্রেক্ষাপটে আলোচনার মাধ্যমে একান্তরের অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে তোমার ধারণা সংক্ষেপে লেখ।

কাজ-৩ : প্রেক্ষাপটে সবাই মিলে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ শুনে, এ সম্পর্কে তোমার মতামত লেখ।

পাঠ-৩ : ২৫শে মার্চের নারকীয় হত্যাকাণ্ড

পাকিস্তানি সেনারা ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যে গণহত্যার অভিযান চালিয়েছিল তার নাম দিয়েছিল 'অপারেশন সার্চলাইট'। ২৫শে মার্চ মধ্যরাত্রে এ অপারেশন সংগঠিত হলেও মূলত এর প্রকৃতি চলতে থাকে মার্চের প্রথম থেকে। ওরা মার্চ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত অস্ত্র ও রসদ বোঝাই এম.ভি. সোয়াত জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৫ই মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ ঢাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনার ভান করে আসলে অভিযানের প্রকৃতি পূর্ববেক্ষণ করেন ও অপারেশন সার্চলাইট চূড়ান্ত করেন।

অপারেশন সার্চলাইট অনুযায়ী ঢাকা শহরে গণহত্যার মূল দায়িত্ব দেওয়া হয় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর মেজর জেনারেল রাও করমান আলীকে। পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথমেই ঢাকা শহরের পিলখানার ইপিআর হেডকোয়ার্টার্স এবং রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সের নিয়ন্ত্রণভার পাকিস্তানি সেনাদের গ্রহণ করার কথা ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় আক্রমণ, বঙ্গবন্ধুকে প্রেক্ষতার, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ও রেডিও-টেলিভিশন নিয়ন্ত্রণ, স্টেট ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ, আওয়ামী লীগ নেতাদের প্রেক্ষতার, ঢাকা শহরের যাত্রাঘাত ব্যবস্থাসহ শহর নিয়ন্ত্রণ ছিল হানাদার সৈন্যদের প্রাথমিক দায়িত্ব। অপারেশন সার্চলাইটের ফর্ম-৩, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়-৮ম



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণহত্যা

আওতায় রাজশাহী, যশোর, খুলনা, রংপুর, সৈয়দপুর, কুমিল্লায় সেনাবাহিনী, ইপিআর, আনসার, পুলিশের বাঙালি সদস্যদের নিরস্ত্র করার কথা উল্লেখ ছিল। চট্টগ্রাম বন্দর ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা দখলে রাখাও তাদের লক্ষ্য ছিল। ঢাকার বাইরে এ অপারেশনের প্রধান দায়িত্ব পান মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা। সার্বিকভাবে এ পরিকল্পনার তত্ত্বাবধান করেন গভর্নর লে. জেনারেল টিকা খান।

পাকিস্তানি সৈন্যরা ২৫শে মার্চ রাত ১১.৩০ মিনিটে ঢাকা সেনানিবাস থেকে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। এ সময় তাদের প্রথম আক্রমণের শিকার হয় ঢাকার ফার্মগেইট এলাকায় রাস্তায় মিছিলরত মুক্তিকামী বাঙালি। একই সাথে আক্রমণ চালানো হয় পিলখানা ও রাজারবাগ পুলিশলাইন্সে। বাঙালি সৈন্যরা পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিহত করার চেষ্টা করে। কিন্তু মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সৈন্যদের পরিকল্পিত আক্রমণ ঠেকানোর মতো অস্ত্র ও প্রস্তুতি ছিল না তাদের। ফলে পাকিস্তানি সেনারা সেই রাতে তাদের অনেককেই নির্মমভাবে হত্যা করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে আক্রমণ পরিচালিত হয় গভীর রাতে। ইকবাল হল (বর্তমান জহুরুল হক হল) ও জগন্নাথ হলে ঢুকে পাকিস্তানি সেনারা গুলি করে ঘুমন্ত অনেক ছাত্রকে হত্যা করে। ঢাকা হলসহ (বর্তমান শহীদুল্লাহ হল) বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকা এবং রোকেয়া হলেও তারা ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায়। মার্চের এই গণহত্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ জন শিক্ষকসহ ৩০০ ছাত্র-ছাত্রী ও কর্মচারী নিহত হন। জহুরুল হক হল সংলগ্ন রেলওয়ে বস্তিতে সেনাবাহিনী আগুন দিলে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ সংগঠিত হয়। শুধু ২৫শে মার্চ রাতেই ঢাকায় ৭ থেকে ৮ হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হয়।

ঢাকার বাইরে সারা দেশে সেনানিবাস, ইপিআর ঘাঁটিতে আক্রমণ চালিয়ে পাকিস্তানি সেনারা অসংখ্য বাঙালি সেনাকে হত্যা করে। এভাবে আক্রমণের শুরুতেই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশের পুলিশ ও ইপিআর ঘাঁটিগুলোর উপর তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এসব এলাকায় বহু নিরীহ লোককে হত্যা করা হয়।

অপারেশন সার্চলাইট অনুযায়ী, ২৫শে মার্চ রাত দেড়টায় (২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে) বঙ্গবন্ধুকে তাঁর ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কের বাসা থেকে পাকিস্তানি বাহিনী গ্রেফতার করে। তবে গ্রেফতারের আগেই তিনি স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে দেশবাসীকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান।

কাজ- ১ : অপারেশন সার্চ লাইটের আওতায় সংগঠিত গণহত্যার ঘটনা দলগতভাবে অভিনয় করে দেখাও।

কাজ- ২ : অপারেশন সার্চলাইটের ভয়াবহ রূপ বর্ণনা করো।

পাঠ- ৪ : ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা

২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা ছিল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বঙ্গবন্ধু তাঁর সেই স্বাধীনতার ঘোষণায় কী বলেছিলেন? তিনি বলেন, “ইহাই হয়ত আমার শেষ বার্তা, আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনগণকে আহ্বান জানাইতেছি যে, যে যেখানে আছে, বাহার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে রুখে দাঁড়াও, সর্বশক্তি দিয়ে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করো। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি হইতে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও”। স্বাধীনতার



এ ঘোষণা বাংলাদেশের সকল স্থানে তদানীন্তন ইপিআর এর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ট্রান্সমিটার, টেলিগ্রাম ও টেলিফোনটারের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ তা প্রচারে এগিয়ে আসেন। এদিকে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের কয়েকজন উৎসাহী দেশপ্রেমিক কর্মী বেতারের কালুরঘাট সম্প্রচার কেন্দ্রকে ‘স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র’ রূপান্তরিত করেন। ২৬শে মার্চ দুপুরে চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ হান্নান এই বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি প্রচার করেন। ২৭শে মার্চ সন্ধ্যার একই বেতার কেন্দ্র হতে বাঙালি সামরিক অফিসার মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। বেতারে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে প্রচারিত স্বাধীনতার এই ঘোষণা সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড আশা ও উজ্জীপনার সৃষ্টি করে। সকলেই স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্যে উদযীব হয়ে উঠে। ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার পর থেকে মুক্তিযুদ্ধ একটি বাস্তব রূপ লাভ করে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক প্রকৃতি বিক্ষিপ্তভাবে শুরু হলেও ক্রমান্বয়ে এটি একটি পণ্যবুদ্ধে রূপ নেয়। এদেশের সর্বস্তরের মানুষ, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবকদের সঙ্গে সেনাবাহিনী, ইপিআর, পুলিশ ও আনসারে কর্মরত বাঙালিরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে এ যুদ্ধে অংশ নেয়।

কাজ- ১ : বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা এবং স্বাধীনতা সম্পর্কিত অন্যান্য ঘোষণা সম্পর্কে শিক্ষকের সহায়তায় সংক্ষেপে লেখ।

পাঠ- ৫ : মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি ও অস্থায়ী সরকার গঠন

মুক্তিযুদ্ধে গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। একে কখনো অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার, আবার কখনো প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারও বলা হয়। তবে এটি মুজিবনগর সরকার নামে বেশি পরিচিত। এ সরকারের নেতৃত্বেই মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত ও পরিচালিত হয় এবং বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়।

১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল গঠিত হয় মুজিবনগর বা বাংলাদেশ সরকার। ওই দিনই মন্ত্রিসভা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ২৬শে মার্চ ঘোষিত স্বাধীনতার ঘোষণা অনুমোদন করে। তবে মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল। শপথ বাক্য পাঠ করান অধ্যাপক ইউসুফ আলী।

আওয়ামী লীগ সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি (পদাধিকার বলে সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক)। সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি (বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক) এবং তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। অন্য তিন জন মন্ত্রী ছিলেন অর্থমন্ত্রী এম. মনসুর আলী, স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী এ এইচ এম কামারুজ্জামান, পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (মুজিবনগর সরকার)-এর কার্যক্রম

মুজিবনগর সরকারের কার্যক্রমকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়- ক. বেসামরিক কার্যক্রম খ. সামরিক কার্যক্রম।

প্রত্যেক দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও এর অধীনে দপ্তর থাকে। মুজিবনগর সরকারেরও তা ছিল। এগুলো হচ্ছে- প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, অর্থ-শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়, সাধারণ প্রশাসন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ, প্রকৌশল বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, যুব ও অভ্যর্থনা শিবিরের নিয়ন্ত্রণ বোর্ড, সংস্থাপন, আঞ্চলিক প্রশাসন, তথ্য ও বেতার, স্বরাষ্ট্র, সংসদ বিষয়ক, কৃষি ইত্যাদি।

বাংলাদেশকে ১১টি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত করে সংশ্লিষ্ট এলাকার সংসদ সদস্য বা আওয়ামী লীগ নেতাদের অঞ্চলগুলোর দায়িত্ব দেওয়া হয়। মুক্তিযুদ্ধকালীন জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে আট সদস্যবিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। আওয়ামী লীগ নেতা ছাড়াও এর সদস্য ছিলেন প্রবীণ জননেতা ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) এর সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, কমিউনিস্ট পার্টি প্রধান মণি সিংহ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) এর আরেক অংশের সভাপতি মোজাফফর আহমদ ও কংগ্রেস নেতা মনোরঞ্জন ধর। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মোজাফফর আহমদ চৌধুরীকে চেয়ারম্যান করে গঠিত হয় মুজিবনগর সরকারের পরিকল্পনা কমিশন।

কাজ : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (মুজিবনগর সরকার)-এর পরিচয় দাও।

পাঠ-৬ : মুক্তিবাহিনী গঠন ও কার্যক্রম

মুজিবনগর সরকার সূচী ও পরিকল্পিতভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন কর্নেল এম.এ.জি. ওসমানী। এছাড়া চিফ অব স্টাফ ছিলেন কর্নেল (অব.) আবদুর রব। ডেপুটি চিফ অব স্টাফ ছিলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার।

মুক্তিযুদ্ধের ১১টি সেক্টর : মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার্থে বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে ১১ জন সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়। প্রত্যেক সেক্টর বেশ কয়েকটি সাব-সেক্টরে বিভক্ত ছিল। সেক্টরগুলোর পরিচয় নিচে তুলে ধরা হলো-

এক নম্বর সেক্টর : চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ফেনী নদী পর্যন্ত এলাকা।

দুই নম্বর সেক্টর : নোয়াখালী, আখাউড়া, ভৈরব রেললাইন পর্যন্ত, কুমিল্লা জেলা, সিলেট জেলার হবিগঞ্জ (বর্তমানে জেলা), ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার কিছু অংশ।

তিন নম্বর সেক্টর : আখাউড়া, ভৈরব রেললাইন থেকে পূর্ব দিকে কুমিল্লা জেলা, সিলেট, ঢাকা জেলার অংশবিশেষ ও কিশোরগঞ্জ।

চার নম্বর সেক্টর : সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চল, খোয়াই-শায়েস্তাগঞ্জ রেললাইন ছাড়াও পূর্ব ও উত্তর দিকে ডাউকি সড়ক পর্যন্ত অঞ্চল।

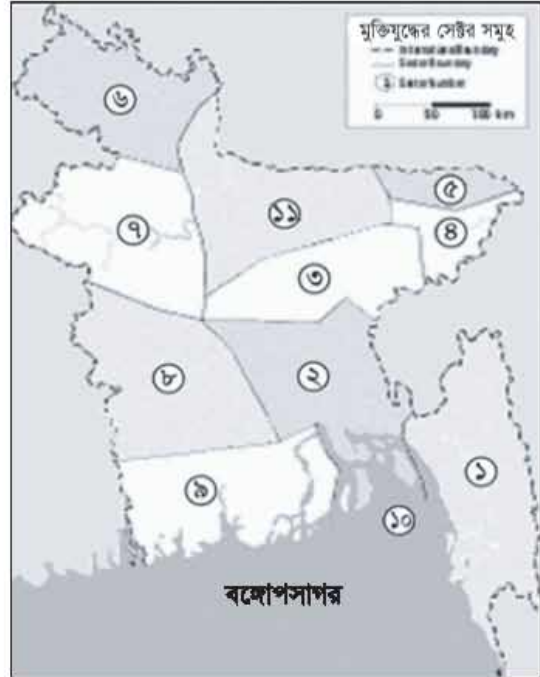
পাঁচ নম্বর সেক্টর : সিলেট জেলার পশ্চিমাঞ্চল, সিলেট-ডাউকি সড়ক থেকে সুনামগঞ্জ-ময়মনসিংহ সড়ক পর্যন্ত এলাকা।

ছয় নম্বর সেক্টর : রংপুর জেলা, দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁও মহকুমা (বর্তমানে জেলা)।

সাত নম্বর সেক্টর : দিনাজপুর জেলার দক্ষিণাঞ্চল, রাজশাহী, পাবনা ও বগুড়া জেলা।

আট নম্বর সেক্টর : কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুরের অধিকাংশ এবং খুলনা জেলার দৌলতপুর-সাতক্ষীরা সড়ক পর্যন্ত এলাকা।

নয় নম্বর সেক্টর : দৌলতপুর-সাতক্ষীরা সড়ক থেকে খুলনা জেলার দক্ষিণাঞ্চল, ফরিদপুর জেলার অংশবিশেষ এবং বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা।



মুক্তিযুদ্ধকালীন সেক্টরের মানচিত্র

দশ নম্বর সেক্টর : দশ নম্বর সেক্টরের অধীনে ছিল নৌ-কমান্ডো, সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল ও অভ্যন্তরীণ নৌপথ।

এগার নম্বর সেক্টর : কিশোরগঞ্জ ছাড়া ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা।

ব্রিগেড কোর্স

১১টি সেক্টর ও তার অধীন অনেক সাব-সেক্টর ছাড়াও রণাঙ্গনকে তিনটি ব্রিগেড কোর্সে বিভক্ত করা হয়। কোর্সের নামকরণ করা হয় ব্রিগেডগুলোর অধিনায়কদের নামের প্রথম অক্ষর দিয়ে। মেজর জিয়াউর রহমান ছিলেন 'জেড কোর্স', মেজর কে.এম. শফিউল্লাহ ছিলেন 'এস কোর্স' এবং মেজর খালেদ মোশাররফ 'কে কোর্স'—এর অধিনায়ক।

নিয়মিত ও অনিয়মিত বাহিনী

মুক্তিবাহিনী সরকারি পর্যায়ে দুইটি শাখার বিভক্ত ছিল - ১. নিয়মিত বাহিনী ও ২. অনিয়মিত বাহিনী।

১. নিয়মিত বাহিনী : ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ইউনিটগুলোর বাঙালি সৈনিকদের নিয়ে এই বাহিনী গঠিত হয়। সরকারিভাবে এদের নামকরণ করা হয় এম. এফ. (মুক্তিকৌজ)। মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশ সরকার নিয়মিত বাহিনী হিসাবে সেনা, বিমান ও নৌবাহিনীও গড়ে তোলে।



২. অনিয়মিত বাহিনী : ছাত্র, যুবক, শ্রমিক, কৃষক ও সকল পর্যায়ের মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে বিভিন্ন সেক্টরের অধীনে অনিয়মিত বাহিনী গঠিত হয়। এই বাহিনীর সরকারি নামকরণ ছিল 'গণবাহিনী' বা এফ. এফ. (ফ্রন্ডম ফাইটার বা মুক্তিযোদ্ধা)।

তাদের নিজ নিজ এলাকায় গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করা হতো। এছাড়া ছাত্রলীগের বাছাইকৃত কর্মীদের নিয়ে গঠিত হয় 'মুক্তিবাহিনী'। কমিউনিস্ট পার্টি ন্যাপ (মোজাককর), ন্যাপ (ভাসানী) ও ছাত্র ইউনিয়নের আলাদা গেরিলা দল ছিল।

আঞ্চলিক বাহিনী : সেক্টর এলাকার বাইরে আঞ্চলিক পর্যায়ে যেসব বাহিনী গড়ে উঠে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—কাদেৱিয়া বাহিনী (টাঙ্গাইল), আফসার ব্যাটালিয়ন (ভালুকা, ময়মনসিংহ), বাতেন বাহিনী (টাঙ্গাইল), হেয়ারেড বাহিনী (গোপালগঞ্জ, বরিশাল), হালিম বাহিনী (মানিকগঞ্জ), আকবর বাহিনী (মাদুরা), সত্যিক মীর্জা বাহিনী (সিরাজগঞ্জ, পাবনা) ও জিয়া বাহিনী (সুন্দরবন)। এছাড়া ছিল ঢাকার গেরিলা দল, বা 'ক্র্যাক গ্রাউন্ড' নামে পরিচিত। ঢাকা শহরের বড় বড় স্থাপনা, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল, ব্যাংক ও টেলিভিশন ভবনে বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় ঢাকার গেরিলারা। এভাবে তারা পাকিস্তানি সেনা ও সরকারের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করে।

শুধু স্থলপথে নয় নৌপথে ‘অপারেশন জ্যাকপট’ নামে পরিচালিত অভিযান চলাকালে একদিনে চট্টগ্রাম বন্দরে ১০টি এবং মংলা বন্দরে ৫০টি জাহাজ ধ্বংস করে মুক্তিযোদ্ধা নৌকমান্ডাগণ সারা পৃথিবীতে সাড়া ফেলে দেন।

কাজ-১ : বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কন করে মুক্তিযুদ্ধের সেক্টরগুলো চিহ্নিত করো।

কাজ-২ : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (মুজিবনগর সরকার)-এর গঠন ও কাজের বর্ণনা দাও।

পাঠ-৭ : মুক্তিযুদ্ধে বিরোধী শক্তির তৎপরতা ও ভূমিকা

তখনকার হিসাবে বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষের প্রায় সকলেই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিল। তবে এদেশের মানুষের একটি ক্ষুদ্রাংশ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা ও দেশবাসীর স্বার্থের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। তারা পাকিস্তানি বাহিনীকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে।

পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার নামে ও ধর্মের দোহাই দিয়ে এই স্বাধীনতা-বিরোধীরা পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে মিলে হত্যা, লুট, অগ্নিকাণ্ড, নারী নির্যাতনসহ সারা দেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিকামী বাঙালি ও প্রগতিশীল বাঙালিদের খুঁজে বের করে তাদের তালিকা পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে তুলে দেয়। তাদের অত্যাচার কখনো কখনো পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচারকেও ছাড়িয়ে যেতো।

মুক্তিযুদ্ধের সময় গড়ে উঠেছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বেশ কয়েকটি সহযোগী সংগঠন-

শান্তি কমিটি : ৯ই এপ্রিল গঠিত হয় ১৪০ সদস্যবিশিষ্ট ‘ঢাকা নাগরিক শান্তি কমিটি’। এ কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিল মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী জামায়াতে ইসলামি, নেজামে ইসলামি, পিডিপি ও মুসলিম লীগ নেতারা। মধ্য এপ্রিলে গঠিত কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির কার্যক্রম জেলা, থানা এমনকি কোথাও কোথাও ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যন্ত প্রসারিত হয়। মূলত এরাই পাকিস্তানি বাহিনীকে পথ চিনিয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিয়ে যায়।

রাজাকার : মুক্তিযুদ্ধের সময় উগ্র-ধর্মাত্মক রাজনৈতিক দলগুলোর প্রত্যক্ষ সহায়তা ও তত্ত্বাবধানে রাজাকার বাহিনী গড়ে উঠে। জামায়াত নেতা মওলানা এ কে এম ইউসুফ ১৯৭১ সালের মে মাসে খুলনায় সর্বপ্রথম রাজাকার বাহিনী গঠন করেন। ধীরে ধীরে অন্যান্য জায়গায়ও রাজাকার বাহিনী গঠিত হয়। এদের বৃহদাংশ ছিল ইসলামি ছাত্র সংঘ ও অন্যান্য উগ্র-ধর্মভিত্তিক দলের সদস্য।

আলবদর : আলবদররা ছিল সাক্ষাৎ যমদূত। জামায়াতে ইসলামি ছাত্র সংগঠন ইসলামি ছাত্র সংঘের ছাত্রদের নিয়ে এ বাহিনী গড়ে উঠে। ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে পাকিস্তানি বাহিনী বুদ্ধিজীবী অপহরণ, নির্যাতন ও হত্যার যে পরিকল্পনা করে তা বাস্তবায়ন করে আলবদর বাহিনী।

আল-শামস : আল-শামস আলবদরের মতোই আরেকটি সংগঠন। মুসলিম লীগ ও অন্যান্য সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনগুলো সম্মিলিতভাবে আল-শামস বাহিনী গঠন করে।

ডা. মালিক মন্ত্রিসভা

পাকিস্তান সরকার বহির্বিশ্বকে বিভ্রান্ত করতে সামরিক গভর্নর জেনারেল টিক্কা খানকে সরিয়ে তার জায়গায় বেসামরিক ব্যক্তি ডা. আবদুল মোতালিব মালিককে গভর্নর নিযুক্ত করে। তার নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী তথাকথিত বেসামরিক সরকার ১৭ই সেপ্টেম্বর গঠিত হয়। ১০ সদস্যবিশিষ্ট মালিক মন্ত্রিসভা পাকিস্তানি সামরিক জাভার পক্ষ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং বিভিন্ন বক্তৃতা-বিবৃতি ও নির্দেশের মাধ্যমে স্বাধীনতা-বিরোধী কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখে। ১৪ই ডিসেম্বর এ সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

কাজ : মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী বিভিন্ন দল ও সংগঠনের পরিচয় দাও।

পাঠ-৮ : মুক্তিযুদ্ধে দেশি ও বিদেশি সহযোগিতা

ক. প্রবাসে বাঙালিদের ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী বাঙালিরা গণহত্যার প্রতিবাদে ও মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে একত্রিত হতে থাকে। যুক্তরাজ্যকে কেন্দ্র করে সমগ্র ইউরোপে প্রবাসীদের আন্দোলন চলে। যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, সুইডেন, ফ্রান্স, কানাডা ও ইন্দোনেশিয়ার বাঙালিরাও সোচ্চার হয়ে উঠে। গণহত্যার প্রতিবাদে তারা সভা-সমাবেশ আয়োজন করে, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠন ও অর্থ সংগ্রহ করে। কেউ কেউ ভারতে গিয়ে প্রশিক্ষণ শেষে যুদ্ধে অংশ নেয়। বহির্বিশ্বে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন আদায়ের জন্য মুজিবনগর সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে বিশেষ দূত নিয়োগ করে। তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিদেশে সমর্থন আদায় ও জনমত গঠনের চেষ্টা করেন। যারা এ সময় জীবন ও চাকরির মায়া ত্যাগ করে বাংলাদেশের পক্ষে যোগ দেয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইরাক, ফিলিপাইন, আর্জেন্টিনা, ভারত ও হংকং দূতাবাসের বাঙালি কর্মকর্তারা। তাদের পদত্যাগ ও বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করে। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর প্রচেষ্টায় জাতিসংঘে ৪৭টি দেশের প্রতিনিধি বাংলাদেশ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। এতে পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুদণ্ড স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই এপ্রিল মাসে প্রবাসী বাঙালি মহিলাদের একটি প্রতিবাদ মিছিল লন্ডনের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণের পর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে গিয়ে স্মারকলিপি পেশ করে। জুন মাসে বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে লন্ডনে মিছিলের আয়োজন করে। মিছিল শেষে এই প্রতিবাদকারীরাও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে গিয়ে স্মারকলিপি পেশ করে।

মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকেই বাংলাদেশ সরকার (মুজিবনগর সরকার) দিল্লি ও কলকাতায় বাংলাদেশের দুটি মিশন স্থাপন করে। কলকাতাতেই প্রথম বাংলাদেশ মিশন স্থাপিত হয়। এছাড়া বাংলাদেশ সরকার (মুজিবনগর সরকার) ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক এবং লন্ডনেও বাংলাদেশ মিশন স্থাপন করে। এসব মিশন বাংলাদেশের পক্ষে মিছিল, সমাবেশ, বিভিন্ন অনুষ্ঠান, পার্লামেন্ট সদস্যদের সমর্থন আদায় ও বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জনমত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অবদান রাখে।

খ. বহির্বিষয়ের ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পৃথিবীর বড় ও ছোট অনেক দেশ বিশেষ করে প্রতিবেশী ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন বিভিন্নভাবে এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এসব দেশের মধ্যে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সরাসরি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিল। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন ছিল পাকিস্তানের পক্ষে।

ভারত

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণে ভারতের অবদান চরমত্বপূর্ণ। ভারত সরকার ২৫শে মার্চ থেকে সংগঠিত পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার নিন্দা করে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানের অঙ্গুষ্ঠাতে তখন যে গণহত্যা শুরু হয়েছিল, ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তা প্রতিহত করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে প্রায় তিন সপ্তাহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। এসব রাষ্ট্র সম্বন্ধে তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, কূটনৈতিক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলেন। নভেম্বরে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সাথে দেখা করেন। এছাড়া ওয়াশিংটনে তিনি বাংলাদেশ মিলনের কর্মকর্তাদের সাথেও সাক্ষাৎ করেন। তাঁর সাথে ভারতের বিভিন্ন মন্ত্রী, নেতা ও কর্মকর্তারাও বিদেশ সফর করে বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বজনমত গঠনে ভূমিকা রাখেন।



শরণার্থী শিবির



শরণার্থী শিবির পরিদর্শনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

গণহত্যার হাত থেকে বাঁচতে সীমান্ত পেরিয়ে আসা প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে ভারত আশ্রয় দেয় এবং তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয়। বাঙালি শরণার্থীদের ব্যয় নির্বাহের জন্য ভারত সরকার এ সময় ‘শরণার্থী কর’ নামে নতুন একটি কর আরোপ করে। ভারতের মাটিতে এপ্রিলের শেষ দিকে বাঙালি যুবকদের সশস্ত্র ট্রেনিং দেওয়া শুরু হয় যা নভেম্বর মাস পর্যন্ত চলে। পাশাপাশি কলকাতায় প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার পরিচালনা ও ‘স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র’ নামে এই সরকারের বেতার কেন্দ্র ছাপনে ভারত সহায়তা করে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতীয় সেনাবাহিনীর চার হাজার অফিসার ও জওয়ান প্রাণ বিসর্জন দেয়। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সে দেশের সর্বস্তরের জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ও সব ধরনের

সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসে। সরকারের পাশাপাশি ভারতের অধিকাংশ রাজনৈতিক দল, বেসরকারি সংগঠন, লেখক-শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী সম্প্রদায় সকলেই এ সময় আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায়। ভারতের খ্যাতিমান শিল্পী রবি শঙ্করের উদ্যোগে নিউইয়র্কে ‘কনসার্ট ফর বাংলাদেশ’ এর আয়োজন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পী জর্জ হ্যারিসন এই কনসার্টে অংশ নেন। কনসার্ট থেকে প্রাপ্ত অর্থ বাংলাদেশ সরকার (মুজিবনগর সরকার)-এর হাতে তুলে দেয়া হয়।



‘কনসার্ট ফর বাংলাদেশ’ এ জর্জ হ্যারিসন

সোভিয়েত ইউনিয়ন

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভূমিকা রেখেছিল। এপ্রিলের শুরুতেই সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট নদার্নি বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে চিঠি দেন। ৩রা ডিসেম্বর চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধবিরতি বিলম্বিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধবাহিনী যাতে সামরিক বিজয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ও সুযোগ পায়। বৌদ্ধবাহিনীকে ঢাকা দখল করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যে কোনো প্রকারে যুদ্ধবিরতির পদক্ষেপকে ঠেকিয়ে রাখাই নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভোটো দানের উদ্দেশ্য ছিল। তাদের এ উদ্দেশ্য সফল হয়।

যুক্তরাষ্ট্র

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি নীতি ছিল পাকিস্তানের পক্ষে। প্রথমদিকে অস্ত্র এবং সমর্থন দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকার পাকিস্তানকে সহায়তা করে। তবে নিজ দেশের বিরোধী দলের চাপে যুক্তরাষ্ট্র সরকার ভারতে অবস্থানরত বাঙালি শরণার্থীদের জন্য আর্থিক সহায়তা দিয়েছিল। ১৯৭১ সালের ৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ শুরুর পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র প্রচণ্ড ভারত-বিরোধী ও পাকিস্তান-বৈধা নীতি অনুসরণ করতে থাকে। স্বভাবতই তাদের ভূমিকা বাংলাদেশের বিপক্ষে যায়। এ সময় যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সমর্থনে ভারত



এডওয়ার্ড কেনেডির শরণার্থী শিবির পরিদর্শন

মহাসাগরে তাদের সপ্তম নৌবহর পাঠায়। সোভিয়েত ইউনিয়নও পাল্টা নৌবহর পাঠায়। তবে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে শেষ পর্যন্ত তারা সে নৌবহরকে কাজে লাগায় নি। পাকিস্তানের পরাজয়ের মুখে যুদ্ধ বিরতি ঘটিয়ে আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে বাধাগ্রস্ত করতেও জাতিসংঘে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালায় যুক্তরাষ্ট্র। তবে যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা কংগ্রেসের অনেক সদস্য, বিভিন্ন সংবাদপত্র, শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদসহ যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সর্বস্তরের জনগণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভূমিকা পালন করে।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ অপারেশন সার্চলাইট শুরু হওয়ার সময় থেকে বিদেশি সাংবাদিকরা পাকিস্তানিদের গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করে। তারাই প্রথম বহির্বিশ্বে বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা ও বর্বরতার খবর ছড়িয়ে দেয়। সাইমন ড্রিং এরকমই একজন সাংবাদিক। ১৯৭১ এর মাঝামাঝি সময়ে পাকিস্তান সরকার কিছু বিদেশি সাংবাদিককে নিয়ন্ত্রিতভাবে বাংলাদেশের কোনো কোনো এলাকা সফর করিয়ে তাদের পক্ষে প্রতিবেদন লেখানোর ফন্দি আঁটে। কিন্তু তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। নিজ চোখে সব দেখে তারা পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতা সম্পর্কে অবহিত হয় এবং সত্য কথা লিখে পত্রিকা ও বেতারের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে তা অবহিত করে। এভাবে এছনি ম্যাসকারেনহাস গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের চাক্ষুষ্যকর তথ্য সারা বিশ্বে প্রকাশ করেন। বিবিসির সাংবাদিক মার্ক টালি পুরোটা সময় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে খবর প্রচার করে গেছেন। এদিকে দেশে অবরুদ্ধ থেকেও অনেক বাঙালি সাংবাদিক ঝুঁকি নিয়ে বিদেশে খবর পাঠিয়েছেন। এজন্য তাদের শত্রুর হাতে চরম মূল্যও দিতে হয়। একান্তরের শহিদ নিজামউদ্দিন ও নাজমুল হক এরকমই দুজন সাংবাদিক। এছাড়া আকাশবাণী, বিবিসি, ভোয়া প্রভৃতি বেতারকেন্দ্র আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছিল। আকাশবাণী কলকাতা থেকে প্রতি রাতে প্রচারিত ‘সংবাদ পরিক্রমা’ খুবই জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ছিল। এটি পাঠ করে দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশের ঘরে ঘরে পরিচিত হয়ে উঠেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ‘বজ্রকণ্ঠ’ ও ‘চরমপত্রসহ’ বিভিন্ন অনুষ্ঠান শ্রোতাদের মুক্তিযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছে।

কাজ- ১ : মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের পক্ষ ও বিপক্ষ শক্তির পরিচয় ও ভূমিকা বর্ণনা করো।

কাজ- ২ : মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকার গুরুত্ব উল্লেখ করো।

কাজ- ৩ : মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা মূল্যায়ন করো।

কাজ- ৪ : গ্রন্থাগার, জাদুঘর ও অন্যান্য সূত্র থেকে খবর ও চিত্র সংগ্রহ করে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি দেয়াল পত্রিকা প্রস্তুত করো।

পাঠ- ৯ : যৌথবাহিনীর নেতৃত্বে চূড়ান্ত যুদ্ধ

মুজিবনগর সরকারের সেক্টরভিত্তিক যুদ্ধ পরিকল্পনার ফলে একাত্তরের মে মাস থেকেই মুক্তিযোদ্ধারা রণাঙ্গনে সাহসের সঙ্গে পাকিস্তানি বাহিনীর মোকাবিলা শুরু করে। জুন মাস থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাঙালি গেরিলা যোদ্ধারা দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে পাকিস্তানি বাহিনীর উপর ব্যাপক আক্রমণ চালাতে থাকে। এতে পাকিস্তানি বাহিনী দিশেহারা হয়ে পড়ে। মূলত মধ্য নভেম্বর থেকে ভারতীয় বাহিনী পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে মুক্তিবাহিনীকে সম্মুখ যুদ্ধে কার্যকর সহায়তা দিতে থাকে। ১৩ই নভেম্বর



যৌথবাহিনীর অভিযান

ট্যাংকসহ দুই ব্যাটালিয়ন ভারতীয় সৈন্য যশোরে ঘাঁটি স্থাপন করে। পাকিস্তানি বাহিনীর উপর আরও সুদৃঢ় আক্রমণের জন্য ২১শে নভেম্বর বাংলাদেশ ও ভারত সরকার একটি যৌথবাহিনী গঠন করে। মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর সমন্বয়ে এটি গঠিত হয়। যুদ্ধকালীন মুক্তিবাহিনীর সহায়তাকারী ভারতীয় বাহিনীকে মিত্রবাহিনী বলা হতো। যৌথবাহিনী গঠনের ফলে স্বাভাবিকভাবেই যুদ্ধ দারুণ গতি লাভ করে।

৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তানি বিমানবাহিনী ভারতের কয়েকটি বিমান ঘাঁটিতে হামলা চালালে শুরু হয়ে যায় পাক-ভারত সর্বাঙ্গিক যুদ্ধ। যৌথবাহিনীর অধীনে বাংলাদেশ সীমান্তে এ সময় আক্রমণ শুরু হয়। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহে চালানো হয় বিমান হামলা। ৬ই ডিসেম্বর ভারত সার্বভৌম দেশ হিসাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। পরের দিন যশোর বিমান বন্দরের পতনের পর যৌথবাহিনী যশোর শহরে প্রবেশ করে। ৮ থেকে ৯ই ডিসেম্বরের মধ্যে কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও নোয়াখালী শহর যৌথবাহিনীর দখলে আসে। ১০ই ডিসেম্বর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালকে নিরপেক্ষ এলাকা ঘোষণা করে ঢাকাছ কূটনৈতিকবন্দ ও বিদেশি নাগরিকদের সেখানে আশ্রয় দেওয়া হয়। ঐদিন বিশেষ বিমানযোগে ঢাকা থেকে ব্রিটিশ ও অন্যান্য বিদেশি নাগরিকদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়। ১১ থেকে ১২ই ডিসেম্বরের মধ্যে ময়মনসিংহ, হিলি, কুষ্টিয়া, খুলনা, রংপুর, রাজশাহী, দিনাজপুর ও সিরাজগঞ্জ মুক্ত হয়।

যৌথবাহিনীর শেষ যুদ্ধ

১২ই ডিসেম্বর ঢাকায় বিভিন্ন সামরিক অবস্থানের উপর যৌথবাহিনীর বিমান হামলা চলে। যৌথবাহিনী চারদিক থেকে ঢাকা অভিমুখে রওয়ানা হয়। এর মধ্যে দেশের সীমান্তবর্তী বিভিন্ন রণাঙ্গনে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ শুরু হয়ে যায়। পূর্ব-পাকিস্তানের তাবেন্দার সরকারের গভর্নর ডা. মালিক ভয়ে পদত্যাগ করে তার মন্ত্রীদেব নিয়ে নিরপেক্ষ এলাকায় অর্থাৎ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আশ্রয় নেয়। ১৪ই ডিসেম্বরের মধ্যে ঢাকা ছাড়া দেশের অন্যত্র অনেক বড় শহর ও সেনানিবাসে পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করে। ঐ দিনই পাকিস্তানি বাহিনীর যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। ঢাকা শহরের চারদিক তখন যৌথবাহিনী ঘেরাও করে রাখে। যে কোনো সময় ঢাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ ঘটতে পারে অবস্থা সে রকম পর্যায়ে পৌঁছে যায়। আত্মসমর্পণের সুবিধার্থে মিত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল স্যাম ম্যাককশ'র আহ্বানে উভয় পক্ষ ১৬ই ডিসেম্বর বিকেল তিনটা পর্যন্ত যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত হয়।



যৌথবাহিনী কর্তৃক গভর্নর হাউস আক্রমণের পর

কাজ-১: মুক্তিবাহিনী, মিত্রবাহিনী ও যৌথবাহিনী সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

কাজ-২: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ছবি সংগ্রহ করে যৌথভাবে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করো।

পাঠ-১০ : গণহত্যা ও নির্যাতন

দখলদার পাকিস্তানি বাহিনী মুক্তিযুদ্ধের পুরো নয় মাস জুড়ে নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। আমরা এর আগে জেনেছি, ২৫শে মার্চ মধ্যরাত থেকে নিরস্ত্র বাঙালিদের উপরে হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। রাতেই তারা সেনানিবাস, ইপিআর দপ্তর, পুলিশলাইন ও আনসার ব্যারাকে হামলা চালিয়ে বাঙালি সদস্যদের হত্যা ও বন্দি করতে শুরু করে। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও তাঁতিবাজারসহ ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে গণহত্যা চালায় ও বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। এই রাতে গণহত্যার শিকার হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গোবিন্দ চন্দ্র দেব, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা এবং ধরে নিয়ে যাওয়া হয় রাজনীতিবিদ শহিদ মশিউর রহমানসহ আরো অনেককে; যাদেরকে পরে আটকে রেখে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়।

পাকিস্তানি বাহিনী আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের দেখামাত্র হত্যার নীতি গ্রহণ করে। সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় ছিল তাদের নির্বিচার হত্যার প্রধান শিকার। তাদের বাড়িঘর, দোকানপাট, পাড়া ও গ্রাম লুট করে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। দেশের শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী সমাজ ছিল পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসরদের বিশেষ টার্গেট। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে ও শেষ পর্যায়ে

এভাবে দেশকে মেধাশূন্য করার পরিকল্পনা থেকে তারা বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপকভাবে হত্যা করে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সাংবাদিক শহিদ সাবের, দানবীর রনদা প্রসাদ সাহা, নূতন চন্দ্র সিংহ, রাজনীতিবিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সঙ্গীতজ্ঞ আলতাফ মাহমুদের মতো বরেন্য ব্যক্তিবর্গ।

দেশের অভ্যন্তরে মানুষ ছিল অবরুদ্ধ, অনেকে পাকিস্তানি বাহিনী ও রাজাকার-আলবদরদের ভয়ে পুরো নয় মাস দেশের ভিতরে আত্মগোপন করে জীবন কাটিয়েছে। আর প্রায় এক কোটি মানুষ দেশ ছেড়ে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। শরণার্থী শিবিরে বৃষ্টিতে ভিজে, রোদে পুড়ে, অপুষ্টিতে ও রোগে ভুগে বহু শিশু প্রাণ হারায়। বৃদ্ধ ও নারীদের জীবনেও নেমে আসে চরম নিপীড়ন। একইভাবে দেশের ভিতরে অবরুদ্ধ মানুষও পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসরদের গণহত্যার শিকার হয়। খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার চুকনগরে ২০মে ইতিহাসের অন্যতম জঘন্য গণহত্যা ঘটে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দ্বারা। পাকিস্তানি বাহিনীকে সহায়তা করার জন্য এদেশের মুসলিমলীগ ও জামায়াতে ইসলামির নেতারা রাজাকার, আলবদর, আল-শামস বাহিনী গঠন করে। এই সকল বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল গোলাম আজম, মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, কাদের মোল্লা, কামারুজ্জামানসহ অনেকে। তারা বাংলাদেশ, বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিকামী মানুষের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। এদের সহায়তায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সংগঠিত হয় নিরাপরাধ লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ, শিশু ও বৃদ্ধদের হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি মানবতা বিরোধী কর্মকাণ্ড। নারী নির্যাতনের মতো ঘণিত কাজেও রাজাকার, আলবদর, আল-শামস বাহিনী সরাসরি জড়িত ছিল।

৩রা ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে যৌথবাহিনীর আক্রমণের ফলে পাকিস্তানের পরাজয় যখন নিশ্চিত তখন তারা বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করার নীল নকশা তৈরি করে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, সাংবাদিক, চিকিৎসক, সঙ্গীতজ্ঞদের ধরে নিয়ে নির্মম নির্যাতন করে হত্যা করে। এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হন সাহিত্যিক অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, কথাশিল্পী আনোয়ার পাশা, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শহীদুল্লাহ কায়সার, সাংবাদিক নিজামউদ্দিন, সিরাজুদ্দিন হোসেন, সেলিনা পারভীন এবং ডা. ফজলে রাব্বী ও ডা. আলিম চৌধুরী মতো বরেন্য ব্যক্তিগণ। জাতির এ সূর্য সন্তানদের অধিকাংশই ১০ থেকে ১৪ ডিসেম্বরে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। তাই শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে প্রতি বছর ১৪ই ডিসেম্বর আমরা শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করে থাকি। বিজয় অর্জনের পরে এসব সূর্য সন্তানদের লাশ রায়ের বাজারসহ বিভিন্ন বধ্যভূমিতে পাওয়া যায়। এই অপরাধের দায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আলবদর, আল-শামস বাহিনীর উপর বর্তায়।

এই পরিকল্পিত গণহত্যা চালাতে গিয়ে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসররা এদেশে অনেক বধ্যভূমি তৈরি করেছে। এর মধ্যে কয়েকটি বড় বধ্যভূমি হলো ঢাকার রায়েরবাজার, চট্টগ্রামের পাহাড়তলি, খুলনার খালিশপুর, সিলেটের শমসেরনগর ইত্যাদি। সারাদেশে বিভিন্ন জেলা ও মহকুমায় নির্জন নদীতীর ও চা বাগানেও অসংখ্য বধ্যভূমি গড়ে তুলেছিল ঘাতকরা।

এই গণহত্যা চলেছে সারাদেশে পুরো নয় মাস জুড়ে। যদিও খুবই নিষ্ঠুর ও লোমহর্ষক তবুও পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের নির্যাতনের ধরন সম্পর্কে আমাদের কিছুটা হলেও জানা দরকার।

বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় নির্ধাতন করে পরে তারা আটককৃতদের হাত-পা বেঁধে গুলি করে হত্যা করে নদী, জলাশয় ও গর্তে ফেলে রাখতো। এছাড়া একটি একটি করে অঙ্গচ্ছেদ করে গুলি করে হত্যা করতো। চোখ উপড়ে ফেলা, মাথায় আঘাত করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা, মুখ খেঁতলে দেওয়া, বেয়নেট ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে হৃদপিণ্ড উপড়ে ফেলা, আঙ্গুলে সূঁচ ফুটানো, নখ উপড়ে ফেলা, শরীরের চামড়া কেটে লবণ ও মরিচ দেওয়া ছিল অত্যাচারের নিষ্ঠুর ধরন। বন্দীশালা ও বধ্যভূমি থেকে বেঁচে আসা অনেকের কাছ থেকে পাওয়া বিবরণ আরও ভয়াবহ যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

কাজ-১: দলগতভাবে মুক্তিযুদ্ধের বিশিষ্ট শহিদদের ছবি সংগ্রহ করে তাদের পরিচিতিসহ অ্যালবাম তৈরি করো।

কাজ-২ : তোমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা প্রদান ও তাঁদের অভিজ্ঞতা শোনার জন্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করো।

পাঠ- ১১ : পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয় ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে। ঐদিন হানাদার বাহিনী তাদের শোচনীয় পরাজয় মেনে নিয়ে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী নিয়ে গঠিত যৌথবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। আমরা লাভ করি প্রিয় মাতৃভূমি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।



আত্মসমর্পণের দৃশ্য

আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দেন যৌথবাহিনীর কমান্ডার লে.জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি মুক্তিবাহিনীর উপ-প্রধান সেনাপতি গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ.কে. খন্দকার। আত্মসমর্পণের দৃশ্য দেখার জন্য রেসকোর্স ময়দান লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। জয়বাংলা শ্লোগানে ঢাকার আকাশ বাতাস মুখরিত হতে থাকে। রেসকোর্স ময়দানের খোলা আকাশের নিচে একটি টেবিলে বসে যৌথবাহিনীর পক্ষে লে. জেনারেল অরোরা এবং পরাজিত পাকিস্তানি



১৬ই ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় উদ্ভাস

বাহিনীর পক্ষে লে. জেনারেল এ.এ.কে নিয়াজি আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেন। বন্দী করা হয় পাকিস্তানি বাহিনীর প্রায় ৯৩ হাজার সদস্যকে।

এভাবে আমাদের মুক্তিবাহিনীর বীরত্বপূর্ণ লড়াই, সমগ্র বাঙালি জাতির স্বাধীনতার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও দৃঢ় ঐক্য, মিত্রবাহিনীর সক্রিয় সহায়তা এবং বিশ্ব জনমতের সমর্থনে মাত্র নয় মাসে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ তার সফল সমাপ্তিতে পৌঁছে। ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা লাভ করি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

কাজ : আত্মসমর্পণের সময় রেসকোর্স ময়দানের দৃশ্য বর্ণনা করো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ১৯৭১ সালের কোন তারিখে মুজিবনগরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়?

- | | |
|---------------|---------------|
| ক. ২৬শে মার্চ | খ. ১০ই এপ্রিল |
| গ. ২৭শে মার্চ | ঘ. ১৭ই এপ্রিল |

২. ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল—

- জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বর্জন করা
- কলকারখানা বন্ধ করে দেওয়া
- সর্বত্র বঙ্গবন্ধুর নিয়ন্ত্রণে চলে আসা

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী নাওমি ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। তার ছবিতে একজন লোক চশমা পরা, কোটপরা, একটি আঙ্গুল উঁচু করে ভাষণ দিচ্ছেন আর উপস্থিত জনতা উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে।